ভূমিকা

বাংলা স্নাতকোত্তর স্তরের প্রথম সেমেস্টারের PGBNG-CC-1-4 পত্র— 'আধুনিক কাব্য-কবিতা'-এর মডিউল ২-এর পঠিত বিষয়—

উনিশ শতকের বাংলা গীতিকবিতা (অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)
নির্বাচিত কবিতা— 'আত্মবিলাপ' (মধুসুদন দত্ত), 'প্রেমের প্রতি' (বিহারীলাল চক্রবর্তী), 'কেন ভালোবাসি' (নবীনচন্দ্র সেন), 'রমণীর মন' (গোবিন্দচন্দ্র দাস), 'প্রণয়ে ব্যথা' (কামিনী রায়), 'প্রকৃতি' (দেবেন্দ্রনাথ সেন), 'জীবনসঙ্গীত' (হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়), 'ভাব' (গিরিন্দ্রমোহিনী দাসী), 'হৃদয়-নদী' (মানকুমারী বসু), 'আমার দেশ' (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়), 'বাংলাভাষা' (অতুলপ্রসাদ সেন), 'বিরহ' (প্রিয়ম্বদা দেবী), 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' (রজনীকান্ত সেন)।

ছাত্রছাত্রীদের সুবিধার্থে নির্মিত বর্তমান সহায়ক আলোচনার উদ্দেশ্য— উনিশ শতকের নবজাগরণের কালে বাংলা গীতিকবিতার বিশেষ একটি প্রবণতা সম্পর্কে সংক্ষেপে পরিচয় প্রদান। বর্তমান আলোচনায় কোনো নির্দিষ্ট কবিতাকে কেন্দ্র করে আলোচনা করা হয়নি। বরং সমকালীন গীতিকবিতায় একটি বহুদৃষ্ট প্রবণতা বা বিষয়কে কেন্দ্র করে আলোচনা অগ্রসর হয়েছে। বর্তমান আলোচনার বিষয়— 'উনিশ শতকের বাংলা কবিতায় নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠা ও নারীজাগরণ'। আলোচনার প্রথমেই এখানে নবজাগরণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তারপর মধুসূদন দত্ত, বিহারীলাল চক্রবর্তী সহ বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য মহিলা কবি যেমন গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, কামিনী রায়, মানকুমারী বসু প্রমুখের কবিতা থেকে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি চয়ন করে কবিতায় কীভাবে নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠা ও নারীজাগরণের বিষয়টি পরিস্ফুট হয়েছিল তা আলোচনা করে দেখানো হয়েছে।

এই বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য', যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের 'বঙ্গের মহিলা কবি', তরুণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'উনিশ শতকের বাংলা কবিতা' ইত্যাদি গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

— ড. মানস কবি
সহযোগী অধ্যাপক,
বাংলা বিভাগ
ও
বারসার,
আশুতোষ কলেজ।

আধুনিক বাংলা কাব্য

উনিশ শতকের বাংলা কবিতায় নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠা ও নারীজাগরণ

বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক, সাহিত্যিক, ধর্মীয় – প্রতিটি ক্ষেত্রেই ঊনবিংশ শতাব্দী একটি গুরুত্বপূর্ণ শতাব্দী, কারণ এই শতাব্দীতেই বাংলাদেশের সার্বিক জনজীবনে ঘটে গেছে সামগ্রিক বিদ্রোহ ও বিপ্লব। বাঙালির ভাবজগতের ভারসাম্য তখন বিভিন্ন অস্থিরতার অভিঘাতেই বাঙালি তার দীর্ঘ পাঁচশত বৎসরের আলস্য-জড়তা-কূপমণ্ডুকতার নির্মোক ছিন্ন ক'রে আধুনিক সভ্যতার রাজপথে এসে দাঁড়াল – বাংলাদেশে যুগান্তরের সূচনা হল। এই রূপটিকেই এক কথায় বলা যায় 'নবজাগরণ' বা 'Renaissance'। আর এই নবজাগরণের কূলপ্লাবী জোয়ারে বাংলা সাহিত্যেও দেখা দিল আধুনিক যুগ। মধ্যযুগের দেবনির্ভর ভক্তিবাদী মানসিকতার পর উনিশ শতকের সূচনায় গদ্যরচনার প্রাথমিক প্রয়াস ও আখ্যানমূলক কাব্যচর্চার প্রেক্ষাপটে নবজাগরণের ফলে ইউরোপীয় সাহিত্যের প্রবর্তনায় ভাবপ্রবণ শিক্ষিত বাঙালী তার মনের মুক্তি খুঁজে পেল গীতিকাব্যের সংহত ও আন্তরিক বিশিষ্টতায়। রোমান্টিক ভাবনা, মানবতাবাদ, দেশাত্মবোধ, আন্তর্জাতিকতা বোধ – এই সব কিছুই দেখা গেল নবজাগরণোদ্ভূত গীতিকাব্যের বিষয়বস্তুর মধ্যে। এবং এই সবকিছুর সঙ্গে অবশ্যম্ভাবী রূপে দেখা দিল আর একটি বিষয়ও – নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠা তথা নারীজাগরণ।

উনিশ শতকের গীতিকাব্যে নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠা ও নারীজাগরণের বিষয়ে আলোচনা করবার পূর্বে ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে নারী জাগরণের সামাজিক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সংক্ষেপে ধারণা করা প্রয়োজন। জাতীয় জীবনের নবজাগরণের পরিপ্রেক্ষিতে তখন নারী সমাজেও এসেছে নবজাগরণ। মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থার অমানুষিক অত্যাচার নিপীড়নের বিরুদ্ধে মানুষ প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, কৌলীন্যপ্রথা, কন্যা-বিক্রয়, শিশুকন্যা হত্যা – এই সব অমানবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধেই সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ নবজাগরণের পুরোধা ব্যক্তিত্ববৃন্দ। এদেশের নবজাগরণের আন্দোলনের অন্যতম বিষয়বস্তু হয়েছিল নারীর সামাজিক ও আইনগত অধিকার। স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতার ভাবনাচিন্তা আকর্ষণ করেছিল সামাজিক দৃষ্টি। রাজা রামমোহন রায়ের 'সতীদাহ নিবারণ আইন পাশ' (১৮২৯ খ্রি.) বা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বিধবাবিবাহ আইন পাশ' (১৮৫৬ খ্রি.) - এর মতো উল্লেখযোগ্য প্রগতিশীল সমাজ সংস্কারমূলক কার্যগুলির ব্যাপক প্রভাব পড়ে সমকালীন সমাজ জীবনে। এই সঙ্গেই চলতে থাকে স্ত্রীশিক্ষার আন্দোলনও। বেথুন স্কুল, ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয় ও ভিক্টোরিয়া কলেজও স্থাপিত হয়। স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন বিদ্যাসাগর। মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার প্রচলন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়; উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও মহিলারা অগ্রসর হন। এই সময়ে শিক্ষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি সর্বক্ষেত্রেই নারীরা এগিয়ে আসতে থাকে। নারী প্রগতি – নারীজাগরণের এই আন্দোলন ও সমাজচেতনা প্রতিফলিত হয়েছে সমসাময়িক কাব্যসাহিত্যের মধ্যে এবং স্বভাবতই ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকবিতার মধ্যেও।

পুরুষশাসিত সমাজে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নারীজাগরণের যে উদ্যোগ লক্ষিত হয় তা মূলত পুরুষদেরই প্রচেষ্টার ফল। আর এর প্রমাণ বাংলা সাহিত্যেও লক্ষ করা যায়। নারীর প্রতি পুরুষের স্বাভাবিক আকর্ষণ, রূপ-সৌন্দর্য-যৌবন তৃষ্ণা-নারীর গুণপনা – নারী শক্তির প্রতি অবিচল আস্থা – এই সব কিছুই পুরুষ কবিদের নারীবন্দনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল বলা যায়। সেই যুগের প্রতিনিধি স্থানীয় কবিদের কাব্যে এর পরিচয় পাওয়া যায়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিহারীলাল চক্রবর্তী, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, দেবেন্দ্রনাথ সেন প্রমুখের কাব্য-কবিতায় এই নারী জাগরণের নারী-বন্দনার প্রতিভাস লক্ষ করা যায়।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্যে' নারীকণ্ঠের বজ্র-ঘোষণা প্রথম ধ্বনিত হয় –

''পর্বত গৃহ ছাড়ি
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশে
কার হেন সাধ্য সে যে রোধে তার গতি?''

তাঁর প্রমীলা চরিত্র এখানে আত্ম-গরিমায় উজ্জ্বল। তিনি 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র তারা, জনা, সূর্পনখা প্রভৃতি চরিত্রের মধ্য দিয়ে পরকীয়া প্রেমের বিজয় নিশান উড়িয়েছেন বাংলার কাব্যাকাশে।

কিংবা হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গনারী-বন্দনার প্রসঙ্গও উল্লেখ করার যোগ্য –

''কোথা হেন শতদল
হৃদে পুরে পরিমল
থাকে প্রিয় মুখ চেয়ে মধুমাখা সরমে
বঙ্গনারী পুষ্প বিনা মধু কোথা কুসুমে?''

এরপর কবি বিহারীলাল চক্রবর্তীর 'বঙ্গসুন্দরী'ও নারীর রূপ মহিমায় প্রকৃতির বন্দনা এবং তাঁর অখণ্ড কল্পনায় নতুন রূপে নারীর স্তোত্র – 'সারদামঙ্গল' কাব্য। কবির কাছে এই নারী – 'সারদা' রূপে আবির্ভূতা, যিনি বিশ্বের সৌন্দর্যলক্ষ্মী, যিনি জীবনের অধিষ্ঠাত্রী – তাঁরই বন্দনা গান করেছেন কবি –

''দাঁড়াও হৃদয়েশ্বরী,

ত্রিভুবন আলো করি,
দু'নয়ন ভরি ভরি দেখিব তোমায়।"

শুধু কাব্য-কবিতাই নয় সমকালীন কথাসাহিত্যে অর্থাৎ উপন্যাসেও নারী-কেন্দ্রিকতার বিষয়টি লক্ষ্য করা যায়। নায়িকা-কেন্দ্রিক উপন্যাস রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র প্রমুখরা পরোক্ষে নারীজাগরণের প্রতিই ইঙ্গিত করেছিলেন। এই সামগ্রিক পটভূমিকায় পুরুষসমাজের অধিকাংশের প্রত্যক্ষ সমর্থন ও স্বীকৃতিতে আস্থাশীল হয়েই মহিলা কবিরাও নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠা ও নারীজাগরণের বিষয়ে উচ্চকণ্ঠ হয়েছেন। তার প্রমাণ মহিলা কবিদের কাব্য-কবিতাতেও খুঁজে পাওয়া যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা কবিতার মধ্যে নবজাগরণের সেই নারীর আভাস পাওয়া যায়, যে নারী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে, স্নেহে, প্রেমে, আত্মসচেতনতায়, আত্মমর্যাদায়, সমাজবোধে উজ্জ্বল; যার কাছে সমাজের ও ব্যক্তিমানবের দাবি অনেক, প্রত্যাশা অনেক। উল্লেখযোগ্য ভাবে বলা যায়, তদানীন্তন মহিলা কবিদের লেখনীর মাধ্যমেও যুগ-যুগান্তের অবহেলিত, অবগুণ্ঠিত নারী নতুন দিনের আলোর দিকে মুখ তুলে তাকিয়েছে। মহিলা কবিরা নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছেন নারীর সামাজিক অবস্থান ও তার আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা। বস্তুতপক্ষে, তৎকালীন সমাজে নারীজাগরণের বিষয়ে পুরুষদের একাংশের সঙ্গে মহিলারাও অনেক সময় বিরোধিতা করেছেন। মেয়েরাই অনেক সময় মেয়েদের শত্রু হয়ে উঠেছে। কবি গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর কবিতায় এর বর্ণনা পাওয়া যায় –

"আমাদের মধ্যে যদি কোন বিনোদিনী
লেখে যদি ধরি' করে কখন লেখনী।
শাশুড়ি আসিয়া তার বাঘিনীর প্রায়,
বলে আজি কেবা রক্ষা করে দেখি আয়।"

এই অবস্থায় পুরুষ-শাষিত সমাজে নারীর আত্মশক্তিকে জাগিয়ে তোলার জন্য বঙ্গমহিলাদের কাছে কবির আহ্বান –

"স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়ে যতেক কামিনী,
ভাসিব আনন্দে মোরা দিন কি যামিনী।
সবে যদি এক যুক্তি ধরে কৃপা ক'রে
আমাদের কষ্ট তবে দূর হ'তে পারে।"

আবার কবি মানকুমারী বসু নারীর আত্মজাগরণের উন্মেষ-আকাঙ্ক্ষায় বলেন –

"রমণী জানে না কিসে মিলিবে মুকতি
আমাদের দেশে এই নারীর বসতি"

কবি প্রসন্নময়ী দেবীর কবিতাতেও পাওয়া যায় নারীর জীবনের প্রতিকূলতার ছবিটি –

"একে তো অবলা নারী তাহে পরাধীনা
কেমনে তোমারে পাবে এ সম্বলহীনা
শ্বশুর শাশুড়ীগণ সবে প্রতিকূল,
সতত থাকি যে নাথ ভয়েতে আকুল।" ['প্রার্থনা']

কিন্তু উনিশ শতকের উল্লেখযোগ্য মহিলা কবি কামিনী রায় নারীর আত্মজাগরণের প্রসঙ্গে নারী শক্তিরই বন্দনা করেছেন –

"রমণীর তরে কাঁদে না রমণী
লাজে অপমানে জ্বলে না হিয়া,
রমণী শকতি অসুরদলনী
তোরা নিরমিত কি ধাতু দিয়া।"

কিংবা পুরুষ-শাসিত সমাজে নারীকে শুধু পুরষের সৌন্দর্য-কল্পনার সম্ভোগ সামগ্রী রূপে দেখার বিরুদ্ধে কবি সুরমাসুন্দরী ঘোষের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর শোনা যায় –

"নারী বুঝি কবিতার প্রিয় সহচরী,
নিষ্ঠুর সংসার যবে করয়ে বঞ্চনা,
নারী রাখে বুকে ধরি যতনে আবরি
ভকত কবির সৃষ্টি, কবিতা কল্পনা।"

আবার নারীজাতির পরাধীনতার গ্লানি মোচনে কবি সরলাবালা সরকারের সাহসিক উক্তি এবং অভিব্যক্তি এইরূপ –

''কে বলে তোমায় পরাধীনা সর্বময়ী বঙ্গবালা তুমি,
দেবী ব'লে প্রতিষ্ঠা করেছে অন্তরেতে পিতা, ভ্রাতা, স্বামী।''

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্ম জাগরণের ক্রমাগ্রসরতার ফলস্বরূপ নারীজাতির নব উদ্বোধনের শুভ শঙ্খধ্বনি তাই বজ্রগম্ভীর সুরে ধ্বনিত হয়েছে কবি কামিনী রায়ের কণ্ঠে –

''নারী আত্মা এইবার জাগে,
প্রলয় আগুন বুঝি লাগে !
রেখেছিলে যারে অন্ধকূপে,
জগদ্ধাত্রী জগন্মাতা রূপে
দাঁড়াবে সে সন্তানের আগে,
এইবার নারী-আত্মা জাগে।''

এইভাবেই গীতিকবিতার বিচিত্র ভাবধারার মধ্যে সেই যুগের মহিলা কবিদের আত্মোপলব্ধি, আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং যুগচেতনার প্রকাশ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। মহিলা কবিদের নিজেদের বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতা ও ভাবাবেগমিশ্রিত গীতিকবিতাগুলির মধ্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর নারীজাগরণের সুস্পষ্ট প্রতিফলন দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে মহিলা কবিদের ভূমিকা সম্বন্ধে সমালোচক যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের মন্তব্য উল্লেখনীয় –

> ''সেকালের বাঙ্গালা সমাজের নেতৃবৃন্দ মনে করিতেন, স্ত্রীলোকেরা লেখাপড়া শিখিলে চরিত্রহীনা ও বিধবা হইবে। সেই অন্ধ বিশ্বাসের যুগে যে সকল মহিলা কবি বিবিধ গ্লানি সহিয়াও কাব্যলক্ষ্মীর সাধনা করিয়া রত্ন আহরণ করিয়াছিলেন তাঁহারা আমাদের বরেণ্যা – একথা বলিতে পারি। কবি মানকুমারী, গিরীন্দ্রমোহিনী, কামিনী রায় প্রভৃতির জীবনী হইতে সেকালের সমাজের অনেকটা পরিচয় পাইবেন।'' ['দ্বিতীয় সংস্করণের কথা'', 'বঙ্গের মহিলা কবি', সম্পাদনা – অলোক রায়]

প্রকৃতপক্ষে গতানুগতিক পারিবারিক বদ্ধ জীবনের গণ্ডি পেরিয়ে, বৃহত্তর সামাজিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য নারীর আত্মোপলব্ধি, চেতনার বিকাশ ও ব্যক্তিসত্তার প্রকাশ ফুটে উঠেছে কবিতাগুলির মধ্যে। এ-যুগের মহিলা কবিদের মধ্যে যেমন – স্বর্ণকুমারী দেবী, লজ্জাবতী বসু, প্রিয়ম্বদা দেবী, প্রমীলা নাগ, পঙ্কজিনী বসু, সরলা দেবী চৌধুরানী, নগেন্দ্রবালা মুস্তাফী প্রমুখদের কাব্য-কবিতায় নারীজাগরণের – নারীর আত্মপ্রতিষ্ঠার কথা অল্প-বিস্তর স্থান করে নিয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের ফলে নারীর আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রত্যয়, আত্ম সচেতনতাই পরবর্তীকালে – বিংশ শতাব্দীর স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের অভূতপূর্ব নারীজাগরণের পূর্বাভাস। উনিশ শতকের বাংলা কবিতাগুলির মধ্যে নারীর স্বাতন্ত্র্য, স্বকীয়তা, চরিত্রমাধুর্য, আত্মচেতনার বিকাশের চিত্র পাওয়া যায়। তাই বিংশ শতাব্দীর উজ্জ্বল সূর্যালোকে রবীন্দ্র-কাব্যে সেই নারী-আত্মা পূর্ণরূপে জেগে উঠে ঘোষণা করেছে – 'আমি নারী আমি মহীয়সী–'। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে নারী সামাজিক বৈষম্য ও দাসত্বের বিরুদ্ধে দৃপ্ত কণ্ঠে বিদ্রোহ করে বলেছে –

''নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেন নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা –''

আরও পরে বিদ্রোহী কবি নজরুলের কণ্ঠেও ঘোষিত হয়েছে নারী-আত্মার জয়গান – 'নারী' কবিতায় নজরুলের কণ্ঠে তাই শোনা যায়–

''সাম্যের গান গাই –
আমার চক্ষে পুরুষ-রমণী কোনো ভেদাভেদ নাই।
বিশ্বে যা কিছু মহান্ সৃষ্টি চিরকল্যাণকর,
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।''

এই সমানাধিকারের প্রবল দাবি নিয়েই নারী-আত্মার পূর্ণ প্রতিষ্ঠাকল্পে স্বাধীনতা-উত্তরকালে বাংলা কবিতার আসরে অবতীর্ণ হয়েছেন কবিতা সিংহ, কৃষ্ণা বসু, নবনীতা দেবসেন, তিলোত্তমা মজুমদার, তসলিমা নাসরিনের মতো উল্লেখযোগ্য মহিলা কবিরা। আসলে যাপিত জীবনের যন্ত্রণা, বন্দী জীবনের বেদনা, সামাজিক নিগ্রহ ও বিবিধ প্রতিকূলতার থেকেই নারীদের এই আত্ম-প্রতিষ্ঠার প্রতিবাদী মানসিকতা উদ্ভূত হয়েছে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে এই অভূতপূর্ব নারী জাগরণের সূচনা হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের আলোকে। আর তারই উজ্জ্বল আলোকোদ্ভাস ধরা দিয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকবিতার মধ্যে।